শ্রম খাতে বৈষম্য ও নির্যাতন এবং শ্রম আইন

কে এম মিন্টু

নারী শ্রমশক্তি বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এই শ্রমশক্তির ওপর ভর করে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ইতোমধ্যে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি বা ইউএন-সিডিপির ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ পেয়েছে। প্রত্যাশা করা হচ্ছে, ২০২৬ সালের মধ্যে যথাযথ প্রস্তুতি সম্পন্ন করে একটি উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে বাংলাদেশ। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হবার অভিযাত্রায় শামিল হয়েও বাংলাদেশ শ্রম খাতের বেশ কিছু জায়গায় পিছিয়ে আছে, যেখানে এখনো অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন প্রয়োজন। তার মধ্যে প্রথমেই বিবেচনা করতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করে শ্রম আইন সংশোধন ও যুগোপযোগী করা। সংশোধনীতে বিশেষ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে পরিবর্তন আনা জরুরি :

- মজুরিবৈষম্য নিরসন করে সময়মতো মজুরি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;
- শ্রম আইনে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা;
- কর্মক্ষেত্রে যৌন সহিংসতা ও হয়রানি বন্ধে ২০০৯-এর নীতিমালা এবং শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে তদারকি ও পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা;
- পোশাক খাতসহ সব খাতে নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত করা;
- নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা রাখা;
- নারী শ্রমিকদের চাকুরির অনিশ্চয়তা দূর করা;
- কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের যাতায়াতের জন্য অফিস পরিবহন নিশ্চিত করা;
- শ্রমিক সংগঠনে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা; এবং
- নারী শ্রমিকদের শ্রম আইন ও অধিকার বিষয়ে সচেতন করতে প্রচারণা চালানো।

হয়রানি ও সহিংসতা রোধে বাংলাদেশে অনেকগুলো বিশেষ আইন করা হয়েছে। তবে কর্মক্ষেত্রে হয়রানি ও সহিংসতা রোধে আইনি কাঠামো তুলনামূলকভাবে এখনো অনেক দুর্বল। তা ছাড়া, বাংলাদেশের শ্রম আইনে কর্মক্ষেত্রে হয়রানি ও সহিংসতাকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় নি। শ্রম আইনের ৩৩২ ধারায় বলা হয়েছে– "কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে কোন মহিলা নিযুক্ত থাকিলে, তিনি যে পদমর্যাদারই হোন না কেন, তার প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্য কেহ এমন কোন আচরণ করিতে পারিবেন না যাহা অশ্লীল কিংবা অভদ্রজনোচিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিংবা

যাহা উক্ত মহিলার শালীনতা ও সম্ভ্রমের পরিপন্থী"। লক্ষণীয় যে, আইনে নারীর প্রতি 'অশ্লীল ও অভদ্রজনোচিত' আচরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা 'মহিলাদের শালীনতা ও সম্ভ্রমের পরিপন্থী'। আইনের এই দৃষ্টিভঙ্গি জেন্ডার সংবেদনশীল তো নয়ই, উপরন্তু এখানে কথিত 'অশ্লীল ও অভদ্রজনোচিত' আচরণকে 'শালীনতা ও সম্ভ্রমের' প্রেক্ষাপটে দেখা হয়েছে, কিন্তু অধিকার লঙ্ঘনের প্রেক্ষাপটে দেখা হয় নি। (বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, মহিলাদের প্রতি আচরণ ৩৩২।)

ধারাটি নারীর প্রতি কর্মক্ষেত্রে ঘটা নানা ধরনের হয়রানি ও সহিংসতাকে সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরে না। এ আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র ২৫ হাজার টাকা, যা অপরাধকে লঘু করে দেখায়। তা ছাড়া, বিদ্যমান শ্রম আইন প্রয়োগের কাঠামোও অনেক দুর্বল। উল্লেখ্য, ২০০৯-এর হাইকোর্টের নীতিমালায় যিনি হয়রানি করছেন, তার শাস্তির বিষয়টি আছে। কিন্তু যিনি হয়রানির শিকার হলেন, তার জন্য কাউন্সেলিং ছাড়া তেমন কিছু নেই। এজন্য আইএলও সনদ ১৯০ অনুযায়ী জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানির ধারাগুলো আইনে অন্তর্ভুক্ত করবার প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রতিটা তৈরি পোশাক কারখানায় গড়ে ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ নারী শ্রমিক কাজ করেন। পোশাক কারখানায় কর্মরত নারী শ্রমিকদের অনেকেই যৌন হয়রানি এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। নির্যাতনকারীর ভূমিকায় শীর্ষে রয়েছেন সুপারভাইজারসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীরা। কারখানার বাইরেও সুপারভাইজারসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীদের দ্বারা প্রতারণামূলক যৌন হয়রানি ও সহিংসতার শিকার হন তারা।

অন্যদিকে পোশাক কারখানায় শ্রমিকদের সিংহভাগ নারী হলেও যারা সিদ্ধান্ত নেন, তারা পুরুষ। ফলে নারী শ্রমিকদের নানা ধরনের হয়রানি ও প্রতিকূল পরিবেশের মুখে পড়তে হয়। স্বাভাবিকভাবেই পোশাক কারখানায় নেতৃত্বের দিক থেকে নারীরা অনেক দুর্বল। পোশাক কারখানায় তাদের নারী বা মানুষ হিসেবে নয়, বরং সস্তা শ্রমিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সে কারণে তারা বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। এই পরিস্থিতি মালিকদের মানসিকতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। তারা নারী শ্রমিকদের কম মজুরিতে নিয়োগ দিয়ে তাদের কাছ থেকে বেশি বেশি কাজ আদায় করতে পুরুষ কর্মকতাদের নিয়োগ দেন এবং যে কোনো উপায়ে অধিক কাজ আদায় করবার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করেন। তারা যেহেতু মালিকদের আদেশ বাস্তবায়নে আদিষ্ট, ফলে নারীরা তাদের দ্বারা যথেচ্ছ নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার হন। কিন্তু কর্মরত নারীদের বিকল্প কোনো কাজে দক্ষতা না থাকা, নির্যাতনের বিচার না পাওয়ার সম্ভাবনা, সামাজিক হেনস্তার আশঙ্কা এবং সর্বোপরি চাকুরি হারানোর ভয়ে প্রায়ই তারা নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ করেন না। ফলে কারখানার ভিতরে-বাইরে নির্যাতনের ধারাবাহিকতা চলতেই থাকে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন মালিকদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন এবং কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নকে শক্তিশালী করা।

নারীর প্রতি যৌন হয়রানি ও সহিংসতা প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন ও নীতি সম্পর্কে কারখানার মালিক, শ্রমিক ও শ্রমিকনেতাদের ধারণা খুবই কম। তাই আইন করার পাশাপাশি সর্বস্তরে আইন বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করাও জরুরি। মালিক, শ্রমিক ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আইনের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ জন্য গণসচেতনতা বাড়াতে হবে। শ্রম মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এসব বিষয় উল্লেখপূর্বক মালিক ও শ্রমিক উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণ করেই আইনগুলো যুগোপযোগী করতে হবে।

শুধু তৈরি পোশাক খাত নয়, বর্তমানে শ্রম বাজারের অন্যান্য খাতেও নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। সে সঙ্গে বাড়ছে যৌন হয়রানি ও সহিংসতার ঘটনা। শ্রম বাজারে নারীর অব্যাহত অগ্রগতি ধরে রাখতে প্রয়োজন নিরাপদ কর্মপরিবেশ। তা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে সমাজের পিছিয়ে পড়া অনেক নারী দেশের শ্রমবাজারে নতুন করে যুক্ত হবেন। ইতোমধ্যে কিছু কারখানায় নারীদের জন্য বিভিন্ন সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, যা এই শিল্পের ব্যাপকতার তুলনায় খুবই সামান্য।

করোনা ভাইরাসের কারণে ২০২০ সালের মার্চ মাসের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পোশাক কারখানার অনেক শ্রমিক চাকুরি হারান। কারো বেতন কমে যায়, অনেকে ঘরবন্দি হয়ে পড়েন। ইতোমধ্যে অনেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন ও খুঁজে নিয়েছেন নিজের জন্য আয়ের ব্যবস্থা। তবে অনেকেই এখনো সন্তোষজনক কোনো কাজে যুক্ত হতে পারেন নি, বরং বাধ্য হয়ে নির্যাতনমূলক পরিবেশে কাজে যুক্ত থেকে আরো ভালো ও নিরাপদ কাজের সুযোগের অপেক্ষায় আছেন।

যৌন হয়রানি ও বৈষম্য প্রতিরোধে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস) এশিয়া ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্স-এর সহযোগিতায় পোশাক কারখানায় সেইফ সার্কেল কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটির মূল কাজ হলো হয়রানির বিষয়গুলো তদারকি করা ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো। এ ছাড়া, সেইফ সার্কেল কমিটির মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে যৌন হয়রানি ও সহিংসতা বিষয়ে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। যার ফলে অন্যান্য খাতের তুলনায় পোশাককর্মীরা এখন অনেক বেশি সচেতন হচ্ছে। কোনটি গ্রহণযোগ্য ও কোনটি নয়, সে বিষয়ে তারা জানার চেষ্টা করছেন। এ ছাড়াও সংগঠনটি ট্রেড ইউনিয়নে নারী নেতাদের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নারী কমিটি গঠন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে।

সম্প্রতি আইএলওর সহযোগিতায় বিএনপিএস নারীদের চলাচলের স্বাধীনতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, হবিগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলায় কর্মক্ষম নারীদের মধ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, উঠান বৈঠক, বাজার বৈঠক, ডোর টু ডোর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এলাকার নারীদের উপার্জনমূলক কাজ সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ করে তোলার পাশাপাশি তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে, যাতে তারা স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগসুবিধাগুলো সম্পর্কে জানতে-বুঝতে পারে ও তা গ্রহণ করতে পারে। এদের মধ্যে অনেকেই ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় নানা উপার্জনমূলক কাজে যুক্ত হয়েছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুব নারী চাকুরির পিছনে না ছুটে ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে ঘরে বসেই উপার্জনে যুক্ত হয়ে উদ্যোক্তা হয়ে উঠেছেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসে, নিজ এলাকার বিখ্যাত জিনিস বা হাতে তৈরি জিনিস বিক্রি করে আয় করছেন তারা। অনেকে লেখাপড়ার পাশাপাশি গড়ে তুলেছেন নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, অনেকে ঘরে বসে আয় করার জন্য আউটসোর্সিং বা ফ্রিল্যান্সার পেশা বেছে নিয়েছেন। অনেকে এই পেশায় সফলও হচ্ছেন। এখানেও নারীদের অনেকে বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছেন। কিন্তুতাদের উন্নয়নে সরকারিভাবে কোথাও তেমন কোনো উদ্যোগ নেই, যদিও সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কথা বলছে। আমরা আশা করি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা নারীদের পেশাগত কাজে সব ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে।

কে এম মিন্টু ট্রেড ইউনিয়নকর্মী, এশিয়া ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্স, বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সাথে যুক্ত। km.mintu.savar@gmail.com